Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501092 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

The Telangana Uprising (1946–1951): A Turning Point in the History of Indian Peasant Movements

তেলেঙ্গানা আন্দোলন (১৯৪৬-৫১): ভারতের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে এক নব অধ্যায়

Dr. Manas Kumar Das
Assistant Professor
History Department
Domkal College, Murshidabad

Received on: 29th April 2026
Accepted on: 19th May 2026

Abstract:

In the closing phase of India's struggle for independence, two significant peasant movements emerged: the Tebhaga movement in Bengal and the Telangana movement in Andhra Pradesh. The Telangana peasant uprising took place in 1946 in the Telangana region, which comprised nine Telugu-speaking districts located east of Hyderabad. It is regarded as one of the most intense and destructive guerrillas struggles in the history of modern India. The uprising was primarily directed against the oppressive rule of the Nizam of Hyderabad. Under his autocratic regime, peasants suffered from the exploitation of feudal landlords, excessive taxation, forced labour (begar), and the brutal repression carried out by the Nizam's private militia known as the Razakars, along with the police forces. In response to these conditions, the peasants of Telangana rose in rebellion.

The movement was led by the Andhra Mahasabha of Hyderabad and the Hyderabad State Communist Party, established under the leadership of Ravi Narayan Reddy and Baddam Yella Reddy. Even in its early stages, the movement received moral support from leaders of the Indian National Congress. Despite initial successes, the movement eventually faced severe repression by the Razakars and the police, and ultimately by military intervention from the Indian state, leading to its decline. Finally, in 1951, the Communist Party was compelled to withdraw the movement.This study seeks to examine the underlying causes of the Telangana movement, the role played by the Communist Party of India in organizing and leading the struggle, its historical significance, and the reasons behind its eventual failure.

Key Words:

Guerrilla warfare, Razakars, Andhra Mahasabha, Vetti system, Standstill Agreement, Accession to India, Tenancy Act

মূল প্রবন্ধ

© Santiniketan Sahityapath

তেলেঙ্গানা আন্দোলন (১৯৪৬-৫১)

ভূমিকা

ভারতের ইতিহাসে কৃষক আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তাদের দোসর দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার, মহাজন ও সামন্ত শ্রেণির দ্বারা সবচেয়ে বেশি শোষিত ও নিষ্পেষিত হয়েছিল কৃষক সম্প্রদায়। তাই ব্রিটিশ শাসনের প্রথম থেকেই কৃষক সমাজ এদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বারংবার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। ঊনবিংশ শতক থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই ধরনের একাধিক আন্দোলন দেখা যায় — সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ (১৭৬৩-১৮০০), নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬০), পাবনা বিদ্রোহ (১৮৭৩-৭৬), মোপলা বিদ্রোহ (১৯২১-১৯২২), একা আন্দোলন (১৯২১-১৯২২), বরদৌলি সত্যাগ্রহ (১৯২৮), বাংলার তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৬-৪৭) — সবগুলিই কৃষক সমাজের অসন্তোষ ও শোষণের প্রতিক্রিয়া। এই দীর্ঘ ধারার মধ্যে ১৯৪৬-৫১ সালের অন্ধ্রপ্রদেশের 'তেলেঙ্গানা আন্দোলন' বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এটি শুধু একটি আঞ্চলিক কৃষক বিদ্রোহ নয়, বরং এই তেলেঙ্গানা আন্দোলন ছিল স্বাধীনতার প্রাক্‌কালে ভারতবর্ষে সংঘটিত সবচেয়ে বিধ্বংসী কৃষক বিদ্রোহ। এছাড়া এই আন্দোলন ছিল একদিকে জমিদারি শোষণের বিরুদ্ধে সাধারণ কৃষকের লড়াই, অন্যদিকে স্বাধীনতার প্রাক্কালে ও স্বাধীনোত্তর ভারতের রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সরাসরি সংঘাত। সর্বোপরি তেলেঙ্গানায় জমিদার শ্রেণির বিরুদ্ধে কৃষকদের গেরিলা যুদ্ধ, জমি দখল ও পুনর্বণ্টন, ভেট্টি (বিনা মজুরিতে শ্রম) প্রথার বিলোপ, নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ, দলিত ও উপজাতি জনগণের অন্তর্ভুক্তি প্রভৃতি এই আন্দোলনকে ভারতের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে এক বিশিষ্টতা দান করেছিল।

জুলাই ১৯৪৬ থেকে অক্টোবর ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়কালে নিজাম শাসিত হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানায় আধুনিক ভারত ইতিহাসের এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে বিধ্বংসী এই গেরিলা যুদ্ধ[i] সংঘটিত হয়েছিল। তেলেঙ্গানার এই কৃষক আন্দোলনে তিন হাজার গ্রামের প্রায় ৩০ লক্ষ দরিদ্র কৃষক অংশ নিয়েছিল এবং প্রায় ১৬ হাজার বর্গমাইল এলাকা জুড়ে এই আন্দোলনের অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছিল। ওয়ারঙ্গাল, নালগোণ্ডা ও খাম্মাম এই তিনটি জেলা ছিল আন্দোলনের মূল কেন্দ্র। তবে অন্যান্য কৃষক বিদ্রোহের ন্যায় ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটানো এই আন্দোলনের লক্ষ ছিল না; বরং ইংরেজদের সমর্থনপুষ্ট দেশীয় জমিদার ও সামন্তদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। এই বিদ্রোহের গুরুত্ব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে হামজা আলাভি বলেছেন — "In its (Telangana Movement) character and political objectives it was the most revolutionary peasant movement that has yet arisen in India".[ii]

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

তেলেঙ্গানা আন্দোলনের উৎপত্তি এবং বিকাশকে বোঝার জন্য এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য। কেবল স্বাধীনতার প্রাক্কালে রাজনৈতিক পরিস্থিতি নয়, বরং ঊনবিংশ শতকের জমিদারি শাসন, কৃষক সমাজের দুর্দশা, ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার প্রভাব এবং হায়দ্রাবাদ রাজ্যের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি — সবকিছু মিলেই আন্দোলনের জন্য ভূমি প্রস্তুত করে।

ধর্মীয় ও ভাষাগত বিভেদ

মূলত ধর্মীয় ও ভাষাগত বিভেদ তেলেঙ্গানা কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল। ইংরেজ শাসনাধীনে হায়দ্রাবাদ ছিল নিজাম শাসিত একটি দেশীয় রাজ্য। শাসক মুসলিম হলেও এখানকার অধিকাংশ প্রজাই ছিল হিন্দু। স্বাভাবিকভাবে হিন্দু প্রজাদের প্রতি রাজার বিদ্বেষমূলক মনোভাব এই অঞ্চলের মানুষদের বিক্ষুব্ধ করেছিল। এছাড়া উর্দুভাষী স্বল্পসংখ্যক ধনী মুসলিম শাসকগোষ্ঠী কানাড়ি, তেলেগু ও মারাঠি ভাষাভাষী হিন্দু প্রজাদের উপর শাসন চালাতো। আর ভারতবর্ষের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রথম থেকেই ভাষা ও সংস্কৃতিগতভাবে তেলেগুদের দমিয়ে রাখার একটা প্রচ্ছন্ন চেষ্টা সবসময়ই ছিল। ভাষা ও আঞ্চলিকতার কারণে অবহেলিত তেলেগুরা নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য ১৯২২ সালে 'অন্ধ্র জন সংঘ' নামে একটি সংগঠন স্থাপন করেন। যা ১৯২৮ সালে 'অন্ধ্র মহাসভা' নাম ধারণ করে আরো বড়ো পরিসরে আত্মপ্রকাশ করে এবং কেবল মাত্র ভাষা কেন্দ্রিক আন্দোলনে সীমাবদ্ধ না থেকে তেলেঙ্গানা অঞ্চলের মানুষের বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে আন্দোলন শুরু করে। আর যেহেতু হায়দ্রাবাদের পূর্বদিকে নয়টি তেলেগুভাষী জেলা নিয়ে তেলেঙ্গানা অঞ্চল গড়ে উঠেছিল। তাই স্বাভাবিক ভাবেই তেলেগু-ভাষী তেলেঙ্গানা অঞ্চলেই প্রথম বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল।

© Santiniketan Sahityapath

অর্থনৈতিক শোষণ

নিজামের শাসনাধীনে হায়দ্রাবাদ মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও শোষণের মৃগয়া ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। এখানে কৃষকদের কোনো প্রকার অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। তাদের অধিকাংশেরই কোনো নিজস্ব জমি ছিল না। দেশের অধিকাংশ জমির মালিক ছিলেন নিজাম স্বয়ং এবং তিনিই ছিলেন শোষকগোষ্ঠীর প্রধান। তারপরে ছিল মুসলিম জায়গিরদার, জমিদার ও হিন্দু দেশমুখরা। কেবলমাত্র নিজামের নিজস্ব জমির পরিমাণ ছিল প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ বিঘা। ১৫ লক্ষ ভূমিদাস সেই বিপুল পরিমাণ জমি চাষ করত। আর অবশিষ্ট জমির প্রায় অর্ধেক ছিল জায়গিরদার ও জমিদারদের দখলে এবং বাকি অর্ধেক জমি দখল করেছিল দেশমুখরা। তারা একসময় ছিল নিজামের খাজনা আদায়কারী। পরে সেই দায়িত্ব অন্যদের উপর অর্পিত হয়। বিনিময়ে দেশমুখরা বিপুল পরিমাণ উর্বর জমি লাভ করে। এই সমস্ত শাসকগোষ্ঠী কৃষকদের উপর অকথ্য অত্যাচার করত এবং তার ওপর ছিল অসংখ্য করের বোঝ; যা দেওয়ার সামর্থ্য তাদের ছিল না। এমনকি এই সময় তেলেঙ্গানা ও সন্নিহিত অঞ্চলে 'ভেট্টি প্রথা' বা বিনা মজুরিতে শ্রম দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। এই প্রথা অনুযায়ী এখানকার নিম্নবর্ণীয় ও দলিত কৃষকদের জমিদারের জমিতে বা ব্যক্তিগত কাজে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করতে বাধ্য করা হতো। প্রতিদিন গৃহস্থালি কাজ থেকে শুরু করে রাস্তা পরিষ্কার, এমনকি জমিদারের পরিবারে বিবাহ বা অন্যান্য উৎসবেও কৃষকদের বেগার খাটতে বাধ্য করা হতো। এটি ছিল দাসত্বের এক রূপ, যা কৃষকদের সামাজিক মর্যাদা ও মানবিক স্বাধীনতাকে লাঞ্ছিত করেছিল। অধ্যাপক সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে জমি-জমার উপর সাধারণ চাষীদের কোনো অধিকারই ছিল না। দেশমুখ আর জমিদারগোষ্ঠী অসংখ্য করের দায়ে ও নানা অছিলায় চাষীদের অধিকাংশ ফসল আত্মসাৎ করে নিত। প্রকৃতপক্ষে যেখানে বাংলাদেশের ভাগ চাষীরা ফসলের অর্ধাংশ পেতো সেখানে তেলেঙ্গানার ভাগ চাষীরা তাও পেতো না। এমনকি মাথা গোঁজার জন্য একখানা কুঁড়ে ঘর বানাতে গেলেও জমিদারদের অনুমতি নিতে হতো। খেত মজুরদের দিনে ১৪ ঘণ্টা পর্যন্ত খাটতে হতো। মূলত এই কল্পনাতীত শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধেই ১৯৩৮-৩৯ সালে তেলেঙ্গানার কৃষকরা প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

সামাজিক বৈষম্য ও বর্ণভিত্তিক শোষণ

তেলেঙ্গানা অঞ্চলে দলিত, আদিবাসী এবং নিম্নবর্ণীয় কৃষকরা সবচেয়ে বেশি শোষণের শিকার হতো। তাদের জমি চাষ করার অধিকার সীমিত ছিল, আবার সামাজিকভাবে তারা প্রান্তিক ছিল। বর্ণভিত্তিক বৈষম্য শুধু অর্থনৈতিক নয়, সামাজিক জীবনের প্রতিটি স্তরে বিদ্যমান ছিল। এই নিপীড়ন জমিদারদের ক্ষমতাকে আরো দৃঢ় করেছিল।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও জাতীয় আন্দোলনের প্রভাব

হায়দ্রাবাদ রাষ্ট্রে নিজাম ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ব্রিটিশদের সঙ্গে মিত্রতা বজায় রেখে চলতেন এবং নিজের রাষ্ট্রকে স্বাধীন রাখার চেষ্টা করছিলেন। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে হায়দ্রাবাদে জাতীয় আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল সীমিত। এতদসত্ত্বেও ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের অনুপ্রেরণা এই অঞ্চলের কৃষকদের আন্দোলনে ইন্ধন জুগিয়েছিল। গান্ধিজির অহিংস সংগ্রাম ও কংগ্রেসের স্বাধীনতার দাবিকে তেলেঙ্গানার কৃষকরা এক ধরনের মুক্তির স্বপ্ন হিসেবে দেখেছিল। তবে স্থানীয় পরিস্থিতি এতটাই কঠোর ছিল যে অহিংস আন্দোলন যথেষ্ট ছিল না। ফলে কৃষকরা সশস্ত্র সংগ্রামের পথ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯৩৯-৪৫) খাদ্য সংকট ও মূল্যবৃদ্ধি গ্রামীণ জীবনে ভয়াবহ সংকট সৃষ্টি করে। একদিকে জমিদার ও মহাজনদের শোষণ, অন্যদিকে যুদ্ধজনিত অভাবের ফলে কৃষকদের তীব্র খাদ্যাভাব দেখা দেয়। এমতাবস্থায় কৃষকরা মহাজনের কাছে চিরস্থায়ী ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে এবং সেই ঋণ শোধ করতে না পারার কারণে বহুক্ষেত্রে কৃষকদের জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়। তবে যুদ্ধ শেষে কৃষক সমাজে নতুন প্রত্যাশা জন্ম নেয়। কারণ বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে ভারতের স্বাধীনতা লাভের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেলে কৃষকরা আশা করেছিল জমিদারি শোষণ বন্ধ হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, নিজাম ও জমিদারদের দমননীতি আগের মতোই বহাল ছিল। রাজাকার বাহিনী গ্রামে গ্রামে গিয়ে কৃষকদের ভয় দেখাত, নারী নির্যাতন করত, জমি বাজেয়াপ্ত করত। এই পরিস্থিতি কৃষকদের ক্ষোভকে বিস্ফোরণের পর্যায়ে নিয়ে যায়। সুতরাং তেলেঙ্গানা আন্দোলন আকস্মিক কোনো ঘটনা ছিল না; বরং দীর্ঘকালীন শোষণ, যুদ্ধোত্তর সংকট এবং রাজনৈতিক জাগরণের যৌথ ফলস্বরূপ এই আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল।

© Santiniketan Sahityapath

তেলেঙ্গানা আন্দোলন (১৯৪৬-৫১)

আন্দোলনের সূত্রপাত (১৯৪৬)

তেলেঙ্গানা আন্দোলনের প্রকৃত সূচনা হয়েছিল ১৯৪৬ সালে নালগোন্ডা জেলার জলগাঁও তালুকে এবং পরবর্তীকালে তা বরঙ্গাল ও বিদর জেলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। যদিও এর পূর্বেই বিভিন্ন অঞ্চলে ছোটোখাটো প্রতিরোধ দেখা গিয়েছিল, কিন্তু ১৯৪৬ সালে মূলত দীর্ঘদিনের সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে কৃষক শ্রেণির প্রতিবাদের বহিঃপ্রকাশ হিসাবেই এই আন্দোলনের সূত্রপাত। তেলেঙ্গানার জলগাঁও তালুকে রামচন্দ্র রেড্ডি নামে জনৈক অত্যাচারী দেশমুখ বা জমিদার তাঁর জমিদারির অন্তর্গত পানাকুর্তি গ্রামের এক ধোপানির জমি দখল করতে উদ্যোগী হলে ডোড্ডা কোমারাইয়া নামে একজন তরুণ কমিউনিস্ট নেতা সেই অসহায় ধোপানিকে এই অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে জমিদারের পোষা গুন্ডার হাতে নিহত হন। এই ঘটনার ফলে কৃষকরা উত্তেজিত হয়ে নালগোন্ডার জলগাঁও, সূর্যপেট ও হুজুরনগর তালুকে স্থানীয় জমিদার ও সামন্তপ্রভুদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এরপর সন্নিহিত ওয়ারঙ্গাল ও খাম্মাম জেলাতেও এই বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। প্রাথমিক পর্বে লাঠি-সোঁটা, গুলতি-পাথর ও লংকার গুঁড়ো ছিল বিদ্রোহীদের হাতিয়ার। এই পর্বে কৃষকদের দাবী ছিল জমি থেকে কৃষকদের জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা চলবে না, কৃষকদের হাতে জমির মালিকানা প্রদান করতে হবে, কৃষকদের উপর বেআইনি খাজনা আদায় ও বেগার শ্রমবন্ধ করতে হবে এবং জমিদার, রাজাকার ও পুলিশ বাহিনীর অত্যাচার বন্ধ করতে হবে প্রভৃতি।

আন্দোলনের নেতৃত্ব

প্রাথমিক পর্বে বিদ্রোহ পরিচালনা করার মতো কোনো নেতৃত্ব তেলেঙ্গানায় ছিল না। তবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, 'অন্ধ্র মহাসভা' ও অন্যান্য সংগঠন ধীরে ধীরে তেলেঙ্গানার কৃষক সমাজকে সংগঠিত করতে শুরু করে। ১৯৩৯ সালে 'অন্ধ্র মহাসভা' কৃষক আন্দোলন সংগঠনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। রবি নারায়ণ রেড্ডি ও ইয়েলো রেড্ডির নেতৃত্বে এই আন্দোলন নতুন দিশা লাভ করে। এমনকি এই আন্দোলন সংগঠনে সার্বিক সাফল্যের কারণে ১৯৪৫ সাল নাগাদ অন্ধ্রমহাসভার সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় এক লক্ষেরও বেশি। নালগোন্ডা, ওয়ারবেঙ্গাল, খাম্মাম ও করিমনগরে অন্ধ্রমহাসভার শক্তিশালী গণভিত্তি ছিল। এছাড়া ১৯৩০এর দশক থেকে কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (CPI) তেলেঙ্গানার গ্রামীণ অঞ্চলে গোপনে যে কৃষক সংগঠন গড়ে তুলেছিল তা ১৯৪৬ সালের বিদ্রোহের পর প্রকাশ্যে নেতৃত্ব গ্রহণ করে। CPI-র নেতৃবৃন্দ স্বতন্ত্র কৃষক সংঘ বা 'কিসান সভা'র মাধ্যমে তেলেঙ্গানার বিভিন্ন অঞ্চলে অনিয়ন্ত্রিত কৃষক প্রতিরোধকে একটি নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে স্থানীয় জমিদার ও ভূস্বামীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনে রূপান্তর করে। CPI কৃষকদের ভূমিকর হ্রাস, ঋণমুক্তি, ভেট্টি প্রথার বিলোপ, জমিদারি উচ্ছেদ, ভূমি পুনর্বণ্টন ও কৃষকশ্রেণির মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবি তোলে।

আন্দোলনের বিস্তার (১৯৪৬-১৯৪৮)

প্রাথমিকভাবে একটি স্থানীয় কৃষক বিদ্রোহ হিসাবে এই আন্দোলনের সূত্রপাত শুরু হলেও ক্রমে এটি একটি সুশৃঙ্খল সশস্ত্র গণআন্দোলনের রূপ নেয়। ১৯৪৬ সালে তেলেঙ্গানার নালগোন্ডা ও ওয়ারাঙ্গাল জেলায় জমিদারদের গুণ্ডাদের হাতে কৃষক নির্যাতনের একাধিক ঘটনা ঘটে। গ্রামীণ কৃষকরা তখন CPI-এর নেতৃত্বে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ছোটো ছোটো গোষ্ঠীতে সংগঠিত হয়ে তারা জমিদারের গুদাম আক্রমণ করে ও শস্য দখল করে। আন্দোলনকারীরা জমিদারদের জমি অধিগ্রহণ করে ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে পুনর্বণ্টন করে। এইপর্বে প্রায় ৩০ লক্ষ একর জমি পুনর্বণ্টনের আওতায় আসে। প্রতিটি গ্রামে 'গণসমিতি' গঠন করা হয়। এই গণসমিতিগুলি স্থানীয় প্রশাসনের বিকল্প রূপ নেয়। এখানেই তেলেঙ্গানা আন্দোলনের আসল রূপ প্রকাশ পেতে শুরু করে। এইসময় পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও অনেকক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। তেলেঙ্গানার বহু অঞ্চলে মহিলা কমিটি গড়ে ওঠে। এমনকি অনেক নারী গ্রামীণ গেরিলা ইউনিটেও যোগ দেন। ফলে আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলে তা দমনের জন্য জমিদারদের রক্ষার্থে নিজামের পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী, এবং রাজাকার নামে তাঁর পোষা গুণ্ডাবাহিনী একত্রে কৃষক ও কমিউনিস্ট কর্মীদের হত্যা, লুণ্ঠন, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ফেলা ও স্ত্রী লোকেদের উপর অবাধে পাশবিক অত্যাচার চালাতে থাকে। এমতাবস্থায় কৃষকরা আত্মরক্ষার তাগিদে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয় এবং পাল্টা আক্রমণের পরিকল্পনা করে। যার ফলে এই আন্দোলন আরো জঙ্গি রূপ ধারণ করে। এই পর্বে পি. সুন্দরাইয়া ও রাজেশ্বর দত্ত আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৪৭এর গোড়ায় প্রথমে তেলেঙ্গানায় জেলাস্তরে ও পরে আঞ্চলিক বা তালুকস্তরে সশস্ত্র গেরিলা বাহিনী গড়ে উঠতে শুরু করে। প্রাথমিক পর্বে ১০০-১২০ জনের একটা দল নিয়ে এক-

© Santiniketan Sahityapath

একটি গেরিলা বাহিনী তৈরি হতো। আর আন্দোলনের তুঙ্গ মূহূর্তে ১০,০০০ গ্রাম প্রতিরক্ষা স্বেচ্ছাসেবী আর জঙ্গী বাহিনীতে প্রায় ২০০০ নিয়মিত সদস্য ছিল। সূর্যপেট, লাল হোন্ডা, হুজুর নগর প্রভৃতি তালুকগুলিতে এ ধরনের সশস্ত্র বাহিনী গড়ে ওঠে। আন্দোলনকারীরা জনগণের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নামে একটি বাহিনী গঠন করে অস্ত্র সংগ্রহ করতে থাকে। ফলে আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়। বিদ্রোহের সাফল্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গেরিলা আক্রমণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কমিউনিস্ট পার্টি একটি নতুন নীতি চালু করে। জমিদার ও ভূস্বামীদের ক্ষেতের শস্য লুট করে সাধারণ মানুষের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক এবং উচ্ছেদকৃত প্রজাদের জমি পুনর্বন্টন করা হয়, বিভিন্ন স্থানে রাজস্ব ও করের নথিপত্র পুড়িয়ে ফেলা হয়, গেরিলারা যেসব গ্রাম মুক্ত করতে সক্ষম হয়, সেখানে 'ভেট্টি' বা বেগার শ্রম প্রথা তুলে দেওয়া হয়। ফলে তেলেঙ্গানার গ্রামাঞ্চল থেকে জমিদাররা বিতাড়িত হয় এবং সেখানে নিজামের পুলিশ-প্রশাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। পরিবর্তে সশস্ত্র বিদ্রোহীরা গ্রামের প্রশাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এমনকি পঞ্চায়েত তহবিলও তাদের হস্তগত হয়।

আন্দোলন দমনের প্রচেষ্টা

তেলেঙ্গানা আন্দোলনের তীব্রতা যখন নিজাম সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল, তখন বিভিন্নভাবে এই আন্দোলনকে দমন করার চেষ্টা করা হয়েছিল। যেমন, ১৯৪৭এ ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার ভিত্তিতে ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা নির্বাচনের মাধ্যমে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে প্রকাশম পাংতুলুর নেতৃত্বে যে মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল সেই পাংতুলুর সরকার অন্ধ্র, তামিলনাড়ু ও কেরালার কৃষক ও শ্রমিকদের বিদ্রোহ দমন করার জন্য এবং কমিউনিস্ট নেতাদের কারারুদ্ধ করার জন্য ১৯৪৭এর প্রথম দিকে একটি ভয়ঙ্কর অর্ডিন্যান্স জারি করে। যার ফলে সাময়িকভাবে অন্ধ্র মহাসভার কমিউনিস্ট সদস্যরা আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই আন্দোলনের গতি অনেকাংশে হ্রাস পায়। অবশ্য ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর মাদ্রাজের প্রকাশম সরকার ঘোষণা করেন যে, প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনকে বেআইনি ঘোষণা করে অধ্যাদেশ জারি করতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেই সময় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নির্দেশের বিরোধিতা করার ক্ষমতা তাঁর প্রাদেশিক সরকারের ছিল না।

ভারত সরকারের সামরিক হস্তক্ষেপ ও আন্দোলনের নতুন পর্ব (১৯৪৮-১৯৫১)

তবে ১৯৪৭ সালের অগস্ট মাস থেকে ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে এই আন্দোলন আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ভারতের স্বাধীনতালাভের পর প্রাথমিকভাবে বিদ্রোহীরা নিজামের স্বৈরাচারী শাসন থেকে মুক্তির স্বপ্ন দেখলেও হায়দ্রাবাদ রাজ্য ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তি না হওয়ার কথা ঘোষণা করলে অচিরেই তাদের সেই স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ফলে পুনরায় এই আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি পায়। এমনকি এই পর্বে নিজামের বিরুদ্ধে আন্দোলনে কংগ্রেসের লোকেরাও বিদ্রোহীদের সমর্থন এবং অস্ত্র ও গোলাবারুদ কেনার জন্য অর্থ সাহায্য করত। তেলেঙ্গানার কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বও নিজাম শাহীর উৎখাত করার জন্য ভারত সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করেছিল এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে ভারত সরকার নিজামকে ক্ষমতাচ্যুত করতে এবং হায়দ্রাবাদকে ভারত ইউনিয়নের সঙ্গে সংযুক্তির জন্য চাপ না দিয়ে পরিবর্তে ১৯৪৭ সালের ১লা নভেম্বর নিজামের সঙ্গে 'স্থিতাবস্থা চুক্তি' (Standstill Agreement) স্বাক্ষর করে। ব্রিটিশ শাসনাধীনে ব্রিটিশ সরকার যেমন নিজামের সেনাবাহিনীর জন্য অস্ত্র ও গোলবারুদ সরবরাহ করত, তেমন এই 'স্থিতাবস্থা চুক্তি' অনুযায়ী ভারত সরকার নিজামের সেনাবাহিনীর জন্য অস্ত্র সরবরাহ করার ধারা অক্ষুণ্ণ রাখে। পাশাপাশি সিদ্ধান্ত হয় আর এক বছর পর নিজাম শাসিত হায়দ্রাবাদ রাজ্য ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবে। ফলে নিজাম বিরোধী আন্দোলনে সরকারের সাহায্য পাওয়ার আশা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফলে পুনরায় এই আন্দোলনের গতি অনেকাংশে হ্রাস পায়। অবশেষে ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বরে হায়দ্রাবাদকে ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর নির্দেশে জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরীর নেতৃত্বে প্রায় ২৬ হাজার ভারতীয় সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী হায়দ্রাবাদে প্রেরণ করা হয়। এই সামরিক অভিযান ইতিহাসে 'অপারেশন পোলো' নামে পরিচিত। এক সপ্তাহের মধ্যে নিজাম ও তাঁর রাজাকার বাহিনী এবং পুলিশ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় এবং ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে হায়দ্রাবাদ রাজ্য ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে আসে। তা সত্ত্বেও তেলেঙ্গানায় কৃষক বিদ্রোহ অব্যাহত থাকে। এমতাবস্থায় তেলেঙ্গানার এই সহিংস কৃষক আন্দোলন দমন করার জন্য ভারত সরকার তেলেঙ্গানার গ্রামীণ অঞ্চলে এক ব্যাপক সেনা অভিযান চালায়। এক্ষেত্রে তাদের মূল লক্ষ

© Santiniketan Sahityapath

ছিল — CPIএর নেতৃত্বাধীন সশস্ত্র গেরিলা বাহিনী দমন করা, গ্রামীণ গণসমিতি ভেঙে ফেলা, আন্দোলনকারীদের গ্রেফতার ও বন্দিশিবিরে রাখা। ভারতীয় সেনা বাহিনীর নির্মম আক্রমণের ফলে বিদ্রোহীরা তাদের নালগোণ্ডা, ওয়ারঙ্গাল, খাম্মাম প্রভৃতি আন্দোলনস্থল ত্যাগ করে কৃষ্ণা ও গোদাবরী অঞ্চল পেরিয়ে দক্ষিণ ও উত্তর-পূর্বে নাল্লামাল্লাই পাহাড়ের ঘন অরণ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এখানে তারা পুনরায় চেঞ্চু ও কোয়া আদিবাসীদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তুলে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার শেষ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন।

অবশেষে ১৯৫০ সাল নাগাদ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব এই দীর্ঘমেয়াদি সশস্ত্র সংগ্রামের সফলতা অর্জনে সীমাবদ্ধতার কথা অনুধাবন করে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রমাগত চাপ, বিপুল প্রাণহানি, গ্রামীণ ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কার কথা উপলব্ধি করে কার্যত বিদ্রোহীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। এভাবে ১৯৫১ সালের মধ্যেই তেলেঙ্গানা আন্দোলন সশস্ত্র আন্দোলন হিসেবে কার্যত সমাপ্ত হয়। তেলেঙ্গানার এই কৃষক বিদ্রোহে প্রায় ৪০০০ কৃষক ও কমিউনিস্ট বিপ্লবীর মৃত্যু হয় এবং প্রায় দশ হাজার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ

তেলেঙ্গানা আন্দোলনের ব্যর্থতার কয়েকটি বিশেষ কারণ ছিল,

- **প্রথমত,** ১৯৪৬-৪৭ সালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এই আন্দোলনের সহায়ক হয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতার লগ্নে নিজামের রাজ্যের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ছিল। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়েরই অভিজাত শ্রেণি স্বাধীন হায়দ্রাবাদের সমর্থক ছিল, এমনকি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণিও হায়দ্রাবাদের ভারতভুক্তি চায়নি। এই অবস্থায় তারা রাজাকার নামে একটি সশস্ত্র বাহিনী গঠন করে নিজামের নেতৃত্বে স্বাধীন হায়দ্রাবাদের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। তেলেঙ্গানায় কৃষক আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে এই রাজাকারদেরই ব্যবহার করা হয়েছিল। অপরদিকে তেলেঙ্গানার বিদ্রোহীরা হায়দ্রাবাদের ভারতভুক্তির পক্ষে ছিল। তাদের দৃষ্টিতে নিজামের শাসন ও স্বাধীন হায়দ্রাবাদ ছিল অভিজাত ও সামন্ত শ্রেণির স্বার্থের অনুকূল। কিন্তু পরে হায়দ্রাবাদের ভারতভুক্তি অনিবার্য হয়ে পড়লে এবং ভারত সরকার সেনাবাহিনী পাঠাতে উদ্যত হলে তারা ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে রাজাকারদের সঙ্গে যৌথভাবে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে। অর্থাৎ কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই আন্দোলনের নেতারা যাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল, এখন তারা তাদের সঙ্গেই হাত মেলায়। এই সময় তেলেঙ্গানা আন্দোলন কিছুটা দিশাহারা হয়ে পড়ে। হামজা আলাভির ভাষায় — "Now the movement was aligned with forces which it had fought in the past and it was running counter to the nationalist movement. This created a great deal of political confusion and split the communist leadership of the movement. Nationalist sentiment, which was a powerful factor in the rise of the Telengana Movement, thus became an important factor leading to its eventual downfall."[iii]
- **দ্বিতীয়ত,** প্রাথমিক পর্বে এই আন্দোলনের সাফল্যের কারণ ছিল নিজাম সরকারের অপদার্থতা ও ব্যর্থতা। নিজামের স্বৈরাচারী শাসন ও তার রাজাকার বাহিনীর অত্যাচার ও শোষণ এই আন্দোলনের অন্যতম কারণ ছিল। কিন্তু নিজামের শাসনের অবসান ও হায়দ্রাবাদের ভারতভুক্তির ফলে এই আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছিল।
- **তৃতীয়ত,** তেলেঙ্গানা আন্দোলন ভারতীয় কৃষক শ্রেণির একটা বড়ো অংশের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়। কেননা প্রাথমিক পর্বে সর্বস্তরের কৃষকেরা এই আন্দোলনে যোগদান করলেও পরবর্তীকালে আন্দোলন ক্রমশ জঙ্গি আকার ধারণ করায় কমিউনিস্টরা মধ্যবর্তী শ্রেণির কৃষকদের সমর্থন হারায়। তাদের জমি বণ্টন আন্দোলন অনেকেরই পছন্দ হয়নি। এক কথায়, কৃষকদের অনৈক্য এই আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
- **চতুর্থত,** তেলেঙ্গানা আন্দোলনে কৃষকদের একটি বড়ো অংশ ছিল আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। তাদের মধ্যে একটি সহজাত ঐক্যবোধ ছিল; কিন্তু পরের দিকে যখন এই আন্দোলনের পরিসর বৃদ্ধি পায় এবং আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের বাইরে তা ছড়িয়ে পড়ে, তখন তার মধ্যে এই ঐক্যবোধের অভাব পরিলক্ষিত হয়; যা এই আন্দোলনের সাফল্যের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।
- **পঞ্চমত,** তেলেঙ্গানা অভ্যুত্থানের ব্যর্থতার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের দায়িত্বও কম ছিল না। তেলেঙ্গানা আন্দোলনের অন্যতম নেতা পি. সুন্দরাইয়া আক্ষেপ করে বলেছেন 'তেলেঙ্গানার সমর্থনে সংহতিসূচক কোনো ধর্মঘট হয়নি।... তেলেঙ্গানা

সশস্ত্র সংগ্রামকে এককভাবে ভারত সরকারের সামরিক বাহিনীর আক্রমণের আঘাত বহন করতে হয়েছিল" (There was no solidarity strikes in support of the Telengana struggle... The Telengana armed struggle alone had to carry the entire brunt of the offensive let loose by the armed forces of the Indian Government.) নতুন নতুন এলাকায় সংগ্রামকে ছড়িয়ে দিতে পারেনি। বরং কমিউনিস্ট নেতৃত্ব একটি নির্দিষ্ট এলাকায় আন্দোলনকে সীমিত রেখেছিলেন। ফলে সামরিক বাহিনীর পক্ষে আন্দোলন দমনের কাজ অনেকটাই সহজ হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া শহরের দরিদ্র মানুষকে তারা অভ্যুত্থানের সঙ্গে যুক্ত করতে পারেনি।

- **ষষ্ঠত,** আন্দোলনকারীদের ভ্রান্ত নীতি এই আন্দোলনের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। কারণ ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর বিদ্রোহীদের পূর্বের নিজাম-বিরোধী সংগ্রামের চেয়ে সদ্য-স্বাধীন ভারতের সরকারকে উৎখাত করার স্লোগান স্বাভাবিকভাবেই বহু মানুষকে বিমুখ করে তোলে। ফলে সংঘর্ষের তীব্রতা অনেকাংশে হ্রাস পায়। কমিউনিস্টরা পরে উপলব্ধি করেছিলেন, ১৯৪৮ সালের পরে সশস্ত্র সংগ্রামকে কেবল কৃষি-সংস্কারের সীমিত লক্ষ্যের গন্ডিতে রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হতো। এরপর কমিউনিস্টরা সম্পন্ন চাষীদের সক্রিয় সমর্থন লাভে বঞ্চিত হন।
- **সর্বোপরি,** ভারতীয় সেনাবাহিনীর আক্রমণ এই আন্দোলনের ব্যর্থতার প্রধান কারণ। কারণ প্রাথমিকপর্বে বিদ্রোহীরা গেরিলা যুদ্ধ পদ্ধতির সাহায্যে নিজামের সৈন্যবাহিনী ও রাজাকার বাহিনীর যৌথ আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারলেও ভারতীয় সেনাবাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করার শক্তি তাদের ছিল না। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বরে হায়দ্রাবাদের ভারতভুক্তির পর নেহরু-প্যাটেলের ভারত সরকার তেলেঙ্গানার কৃষক সংগ্রামকেও অংকুরে বিনাশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কারণ তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, সামন্ততন্ত্রের প্রধান স্তম্ভ হায়দ্রাবাদের এই কৃষক অভ্যুত্থান সাফল্য লাভ করলে অচিরেই তা সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়বে। তাই জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরীর নেতৃত্বে তেলেঙ্গানার কৃষক বিদ্রোহীদের দমনের জন্য একটি সামরিক অভিযান প্রেরণ করা হয়। সম্ভবত কমিউনিস্টদের অগ্রগতিকে প্রতিহত করাই ছিল এই পুলিশি অভিযানের মূল উদ্দেশ্য। প্রাথমিকভাবে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর আক্রমণকে উপেক্ষা করে তেলেঙ্গানার বিপ্লবী কৃষকরা সংগ্রাম চালিয়ে যান। কিন্তু তেলেঙ্গানার কৃষক-প্রজারা তাদের অনুন্নত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রাজাকার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফল হলেও এই পর্বে তাদের সম্মুখীন হতে হয় আরো অনেক উন্নত অস্ত্রশস্ত্র সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে। স্বভাবতই ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আন্দোলনে সাফল্য লাভ করা বিদ্রোহীদের পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। ভারতীয় সেনাবাহিনীর আক্রমণের ফলে শেষ পর্যন্ত তেলেঙ্গানার এই দীর্ঘ কৃষক আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই আন্দোলনের অন্যতম নেতা রবিনারায়ণ রেড্ডি তাঁর 'Heroic Telengana- Reminiscences and Experience' গ্রন্থে বলেছেন, ভারতীয় বাহিনী তেলেঙ্গানা অঞ্চলে ঢুকে পড়ার পর গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া কৃষকদের তরফে ভুল হয়েছিল।[iv]

তেলেঙ্গানা আন্দোলনের প্রভাব ও তাৎপর্য

তবে তেলেঙ্গানা আন্দোলন (১৯৪৬-১৯৫১) ব্যর্থ হলেও এর প্রভাব ও ঐতিহাসিক গুরুত্বকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। এই আন্দোলনের ফলে হাজার হাজার ভূমিহীন কৃষক জমির মালিকানা অর্জন করে এবং পুনর্বণ্টিত জমি কৃষক সমাজে আত্মমর্যাদা এবং অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করে। এই আন্দোলনে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব প্রদানের ফলে সামাজিক চেতনায় পরিবর্তন আসে, দলিত ও উপজাতি জনগণ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে আন্দোলনে সামিল হয়, বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রামীণ সমিতি গঠন সমাজে স্থানীয় গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ঘটায়। এ প্রসঙ্গে সুপ্রকাশ রায় বলেন, 'তেলেঙ্গানা সংগ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তেলেঙ্গানার সংগ্রাম ছিল একই সঙ্গে জমি ও গণতন্ত্রের সংগ্রাম। তেলেঙ্গানার এই সংগ্রামই ভারতের জনগণতন্ত্র স্থাপনের প্রথম প্রয়াস।'

এছাড়া এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে নেহরু ও অন্ধ্র প্রাদেশিক সরকার কৃষকদের স্বার্থে বেশ কিছু আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য হন। এগুলির মধ্যে অন্যতম হলো — জায়গিরদারি প্রথা উচ্ছেদ আইন (Jagirdari Abolition Act) এবং হায়দ্রাবাদ প্রজাস্বত্ব আইন

(Hyderabad Tenancy Act)। অবশ্য আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা সুন্দরাইয়া এই আইন দুটিকে "র‍্যাডিকাল" (Radical) ও "প্রগতিশীল" (Progressive) বলে উল্লেখ করলেও তেলেঙ্গানা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অপর এক কমিউনিস্ট নেতা রাজেশ্বর রাও তাঁর 'The Historic Telengana Struggle' গ্রন্থে আইন দুটির প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করে বলেছেন, জায়গিরদারি ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করা হলেও প্রকৃতপক্ষে জায়গিরদাররা খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। কারণ সরকারের তরফ থেকে জায়গিরদারদের প্রায় ১৭ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল এবং বিশাল পরিমাণ জমি ও প্রাসাদ ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে রেখে দেওয়ার অনুমতি তারা পান। নিজাম বছরে ১ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ ও ২০,০০০ একর জমির ব্যক্তিগত মালিকানা লাভ করেন। ব্যারি পাভিয়ারও তাঁর 'The Telengana Armed Struggle' প্রবন্ধে বলেছেন — এই আইন দুটি ছোটো ভূস্বামী ও ধনী চাষীদের কিছু কিছু সুবিধা দিয়েছিল। তথাপি জায়গিরদারি প্রথা অবসানের ফলে তেলেঙ্গানা থেকেযে দীর্ঘ সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অবসান ঘটেছিল তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

এছাড়া এই আন্দোলনের ফলশ্রুতি-স্বরূপ তেলেঙ্গানা থেকে দীর্ঘদিনের প্রচলিত অপমানজনক ভেট্টি প্রথার অবসান ঘটে এবং ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের পথ প্রশস্থ হয়। তেলেঙ্গানা বিদ্রোহের গুরুত্ব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুনীল সেন লিখেছেন — "তেলেঙ্গানা আন্দোলনের বিজয় স্বীকার্য। নিজামের শাসনের অবসান হল এবং শতাব্দীর পুরনো স্বৈরতন্ত্র ধ্বংস হলো। হায়দ্রাবাদ ভারত ইউনিয়নে যোগ দিল। কোনো সাম্প্রদায়িক ঘটনা এখানে ঘটেনি। সাম্প্রদায়িক শক্তি এখানে পিছু হঠে। শেষপর্যন্ত ১৯৫২ সালে অন্ধ্ররাজ্য গঠিত হলো।" ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের এটি একটি দৃষ্টান্ত। রাজন্যশাসিত রাজ্য হায়দ্রাবাদ ধ্বংসের ফলে কয়েক বছর পর ভাষাভিত্তিক অন্ধ্রপ্রদেশ গঠনের পথ পরিষ্কার হয়। সর্বোপরি এটি ছিল ভারতের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ সশস্ত্র সংগ্রাম। তাই সাফল্যের নিরিখে ভারতবর্ষের গণ-সংগ্রামের ইতিহাসে তেলেঙ্গানার কৃষক অভ্যুত্থানের গুরুত্বকে স্বীকার করতেই হয়।

তথ্যসূত্র:

i. 'আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭', সুমিত সরকার, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৩৮২
ii. 'Peasants and Revolution', Alavi Hamza, In Miliband, Ralph. And Saville, John, Ed. The Socialist Register 1965 A Survey of Movements & Ideas, Merlin Press, London, p. 268
iii. 'Peasants and Revolution', Alavi Hamza, In Miliband, Ralph. And Saville, John. Ed. The Socialist Register 1965 A Survey of Movements & Ideas, Merlin Press, London, p. 269
iv. 'Ravi 'Heroic Telengana-Reminiscences and Experiences', Narayana Reddy, People's publishing House, New Delhi, 1973, p. 60

সহায়ক গ্রন্থ:

1. Sunil Sen, 'Peasant Movement in India, Mid-Nineteenth and Twentieth Century,' K. P. Bagchi and Company, Calcutta, 1982
2. D.N. Dhanagare, 'Peasant Movement in India: 1920-1950', Oxford University Press, New Delhi, 1983
3. Barry Pavier, 'The Telengana Movement: 1944-51', New Delhi: Vikas Publishing House, 1981
4. Barry Pavier, 'The Telengana Armed Struggle', Economic and Political Weekly, vol. 9, Mumbai, August, 1974
5. P. Sundarayya, 'Telengana People's Struggle and its Lessons', Cambridge University Press India Pvt. Ltd., New Delhi, 2006
6. P. Sundarayya, 'Telangana People's Armed Struggle: 1946-1951', Nava Telangana Publishing House, 2016
7. Ravi Narayana Reddy, 'Heroic Telengana- Reminiscences and Experiences', People's publishing House, New Delhi, 1973
8. Hamza Alavi, 'Peasants and Revolution', In Miliband, Ralph. And Saville, John, Ed. 'The Socialist Register 1965 A Survey of Movements & Ideas', Merlin Press, London, 1965
9. K. Sheshadri, 'The Communist Party in Andhra Pradesh', *State Politics in India,* Meenakshi Prakashan, New Delhi, 1967G. Pingle, 'The Fall and Rise of Telengana', Orient Blackswan, Delhi, 2014
10. Hitendra Patel, 'Adhunik Bharat Ka Aitihasik Yatharth', Rajkamal Prakashan, New Delhi, 2022
11. সুপ্রকাশ রায়, 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম', ডি এন বি এ ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ
12. পি সুন্দরাইয়া, 'তেলেঙ্গানার গণসংগ্রাম ও তার শিক্ষা', ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৯০

© Santiniketan Sahityapath

13. পি সুন্দরাইয়া, ‘তেলেঙ্গানার সংগ্রাম’, সংকলন ও ভাষান্তর অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশু সাহিত্য সংসদ
14. সুমিত সরকার, ‘আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭’, কে পি বাগচি অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ২০০৪

—

Prantik Gabeshana Patrika